কথারম্ভ

ঊনবিংশ শতক ধর্মজাগরণের সূচনাকাল হিসাবে চিহ্নিত। এই কালপর্বে ভারতীয় জনজীবনে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে। এই সময়ে বাঙালি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে মুষ্টিমেয় বাঙালির চৈতন্যের জাগরণ ঘটলেও তা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। ঊনবিংশ শতকের একেবারে গোড়াতেই এই গ্রাম বাংলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। গ্রামের প্রকৃতির সহজাত ধর্ম সংস্কৃতিতে বড় হয়েছেন। তাই বাংলার পল্লীজীবনের ধর্মভাবনা, সমাজের পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি একাত্ম ছিলেন যেমন তেমন ভাবেই তিনি বাংলার মানুষের উন্নতি করেছেন। ধর্ম কর্মের জন্যই তিনি যেন জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর ধর্ম ভাবনা ও কার্যাবলীকে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তাঁদের ভক্ত সমাজকে নিয়ে সমাজ কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাদের সমাজ কল্যাণের কার্যাবলীকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। ঊনবিংশ শতকের ধর্মজাগরণের মূল বিষয় ছিল, তৎকালীন সমাজ সংস্কারকগণ ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সন্ধান করেছেন আধুনিক কালে যুক্তি বিজ্ঞানের নিরিখে। যেমন রাজা রামমোহন রায় ধর্ম সংস্কার করেছেন। তিনি বেদের নিয়মাবলীতে ভারতের সংস্কৃতি সন্ধান করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্মের পুনরুত্থান ঘটান। এই প্রাচীন ভারতীয় সনাতনী ঐতিহ্যকে পুনজাগরণ ঘটাতে প্রাক্-ঐতিহাসিক পর্বের ধর্মানুশীলকগণের ধর্মভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে।

সনাতনী ধর্ম সংস্কারের ধর্মজাগরণ ঘটালেন নতুন ভাবে হরিচাঁদ ঠাকুর সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম নামে। এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকেই বলে মতুয়া ধর্ম। হরিচাঁদ ঠাকুর কীভাবে কত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আপন কর্তব্য কর্ম করেছেন মানব কল্যাণে এবং তিনি উত্তরসূরীকেও যোগ্য করে নিয়েছেন তাঁর কার্য ভার বহন করার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজ কল্যাণের জন্য কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সাফল্যে পৌঁছেছেন তারই কাহিনি যেমন আলোচনা করেছি তেমন ভাবে এই নব ধর্ম জাগরণের সমাজ প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেছি যথাসাধ্য।

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম-কর্ম ভাবনা সমাজে প্রয়োগ করে মানুষের জীবনকে উন্নত ভাবে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে প্রাক্ আর্য-পূর্ব ভারতের ধর্ম ভাবনার সন্ধান করেছি তাদের জীবনী মূলক ধর্মসাহিত্যে ও আরো অনেক গ্রন্থের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতকের সমাজের বাস্তবচিত্র ও তুলে ধরার মাধ্যমে সমাজ জীবনকে আলোচনা করেছি। এভাবে সামগ্রিক দিক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। গবেষণার বিষয়কে ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি।

গবেষণা কাজটি যাদের সহায়তায় পরিপূর্ণ ভাবে করতে পেরেছি তাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের কথা। গবেষণার জন্য যে বিপুল অর্থের দরকার সেই জন্য তিনি আমাকে আবেদনপত্র পাঠাতে বলেন 'রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপের' জন্য। আমি আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের সুপরামর্শ অনুযায়ী আবেদন পাঠাই সিনপসিস সহ। আমি রাজীব গান্ধী ফেলোশিপ পাই যার সাহায্যে আমার গবেষণা কাজ সম্ভব হল। আমার বাংলা বিভাগের অবসৃত অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট, ড. নিখিলচন্দ্র রায়, ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. সুবোধ কুমার যশ, ড. উৎপল মণ্ডল, ড. দীপককুমার রায় সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন। ড. দীপককুমার রায়, বর্তমানে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থকারিকগণ আমার চাহিদামত বইয়ের যোগান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার টুঙ্গীদিঘির চিরসবুজ পল্লী পাঠাগারটিও আমি ব্যবহার করেছি গবেষণা কাজে। আর যার শুভ প্রেরণায় এই গবেষণা কাজটি করলাম তিনি হলেন মতুয়াচার্য শ্রীমণিন্দ্রনাথ ঠাকুর বা মণি গোঁসাই। আমার বাবা শিবদাস মণ্ডল ও মা সবিতা মণ্ডল এবং আমার পরিবারবর্গ আমাকে সাহায্য করেছে। আমার সহপাঠী নন্দিতা মণ্ডল ও আমার কলেজের অধ্যাপক অসিত বিশ্বাস আমাকে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সহায়তা করেছে। লেখক মনিমোহন বৈরাগী, লেখক ড. মণিন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হরি গোঁসাই, শঙ্কর গোঁসাই সকলেই আমাকে সাহায্য করেছে গবেষণা কাজে। বুবুন কুমার বর্মণ যার অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অক্ষর বিন্যাস করে আমার গবেষণা কাজটিকে পূর্ণাঙ্গ করেছে। সকলকেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার প্রণাম জানালাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দু-একটি বইয়ের নতুন সংস্করণ না পাওয়ায় পুরানো সংস্করণ

থেকে তথ্য আহরণ করায় বইয়ের ছেঁড়া মলাটের জন্য প্রকাশনা, সংস্থার নাম ও সন তারিখ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমার গবেষণার বিষয়কে যথাযথাভাবে পরিস্ফুটনের জন্য উদ্ধৃতিকে একবারের বেশি ব্যবহার করেছি। প্রুফ দেখার কাজ যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে করা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

স্নিগ্ধা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়